সিপিডি সামায়িকপত্র ৯১

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নারী সংবেদনশীলতা

ফাহমিদা খাতুন

CENTRE FOR POLICY DIALOGUE

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নারী সংবেদনশীলতা

সাময়িক পত্র ৯১

ফাহমিদা খাতুন

প্রকাশক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১ (নতুন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪,
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮১৩০৯৫১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd
http://cpd.org.bd/Blog

প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১০
স্বত্ব: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

মূল্য
টাকা ৩৫.০০

ISSN 1818-1570 (Print)
ISSN 1818-1597 (Online)

C42010_60P91_HDP

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডির প্রধান গবেষণা কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা পর্যালোচনা; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; দারিদ্র্য বিমোচন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার এবং অবকাঠামো উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা; এবং উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান।

সিপিডির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডির একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে **সিপিডি সাময়িক পত্রাবলী** (CPD Occasional Paper Series) প্রকাশ করে থাকে।

সহকারী সম্পাদক: *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ, সিপিডি।
সিরিজ সম্পাদক: *মোস্তাফিজুর রহমান*, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি।

২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নারী সংবেদনশীলতা সাময়িক পত্রটি প্রস্তুত করেছেন সিপিডির অতিরিক্ত পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। পত্রটি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক ২২ জুন ২০১০ তারিখে আয়োজিত 'জেন্ডার বাজেটিং' শীর্ষক আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

সূচি

	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	১
২. নারী সংবেদনশীল অর্থনীতি	১
৩. নারী বাজেট: কী ও কেন	৩
৪. ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নারীর জন্য পদক্ষেপ	৭
৫. শেষের আগে	১১
References	১৩

সারণি ও চিত্র তালিকা

সারণি ১: বাংলাদেশের শ্রম বাজারে লিঙ্গ বৈষম্য	৫
সারণি ২: ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী কর্মজীবিদের খাতওয়ারী অংশগ্রহণ	৫
সারণি ৩: বিভিন্ন দেশের HDI, GDI এবং GEM সূচকের তুলনামূলক অবস্থান	৬
সারণি ৪: বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে নারী-পুরুষের অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র	৬
সারণি ৫: জাতীয় নীতিমালায় নারী বিষয়ক খাতে বরাদ্দ	৭
সারণি ৬: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ	৯
সারণি ৭: দশটি মন্ত্রণালয়ে নারী ও পুরুষের নিয়োজনের হার: ২০০৯-১০	১০
চিত্র ১: জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের লক্ষ্য	৪

১. ভূমিকা

যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজেট হচ্ছে তার কর্মকাণ্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কেননা বাজেটের মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ ছাড়া নীতিমালা বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। কোন প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য বাজেটের মাধ্যমে অনেকখানি প্রভাবিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত প্রাধিকারগুলোও বাজেটে প্রতিফলিত হয়। তেমনি জাতীয় বাজেটের মাধ্যমেও আয়-ব্যয়ের যে হিসাব নিকাশ এবং বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তাতে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার কেন্দ্রবিন্দুগুলোও প্রতিভাত হয়ে থাকে। যদিও একসময় ধারণা করা হতো যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে বাজেট তৈরি হয় সেগুলো জেন্ডার নিরপেক্ষ, কিংবা অর্থের যে সংখ্যাগুলো সেখানে উল্লেখ করা হচ্ছে তার প্রভাব নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ওপর নিরপেক্ষভাবে পড়ে। সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এটি আসলে সত্য নয়। যেভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, কিংবা কর এবং রাজস্ব নীতিমালাগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়, তার প্রভাব নারী ও পুরুষের ওপর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পড়ে। শুধু তাই নয়, এই বরাদ্দ এবং নীতিমালার প্রভাব ধনী-গরীব, শহরবাসী, গ্রামবাসী তথা সমাজের একেক অংশের ওপর একেকভাবে পড়ে। তাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাজেট প্রণীত না হলে তা হয় বৈষম্যমূলক। কেননা সমাজের একেক অংশের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং সক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলো এমনভাবে তৈরি যা কিনা নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি অসমতা সৃষ্টি করে এবং নারীকে একটি অসুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে যায়। বাজেট বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা যায় একটি দেশের সরকার নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা দূর করার জন্য কী ধরনের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে।

নারী বাজেট প্রণয়নের জন্য গত প্রায় দেড় দশক ধরে আন্তর্জাতিকভাবেই সরকারগুলোর ওপর নানা ধরনের চাপ রয়েছে। এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে, শুধু কথার ফুলঝুড়ি বা কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়, এর জন্য অর্থ প্রয়োজন। সাধারণত বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারগুলোর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের প্রভাব কার ওপর কতখানি পড়লো কিংবা এর ফলে জেন্ডার বৈষম্য বাড়লো কি কমলো তা নিয়ে কখনও চিন্তা করা হয় না। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করার জন্য দাবীর পেছনে এই বিষয়গুলো অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে ২০১০-১১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটে কতখানি জেন্ডার সংবেদনশীলতা প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনার একটি প্রয়াস চালানো হয়েছে। তবে তার আগে নারী সংবেদনশীল অর্থনীতি এবং নারী বাজেট বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে যা আগামী অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণের ভিত্তি রচনা করবে।

২. নারী সংবেদনশীল অর্থনীতি

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বর্তমানে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং ধারা চলছে তা অসম এবং অ-অন্তর্ভুক্তিমূলক। এখানে অসমতা দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে। আর এর পেছনে কারণ হলো এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। নারীরা মূলত দুটি কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উপেক্ষিত রয়ে যায়। প্রথমত: সুযোগের অভাব অর্থাৎ বিদ্যমান অর্থনীতি নারীর জন্য কাজের এবং আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ করে দিতে পারে না। তবে সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। সুযোগ কোন কাজেই লাগবে না যদি না তার ব্যবহার করা যায়। তাই দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হলো সক্ষমতার, যেটির অভাব রয়েছে নারীর। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এই দুটো বিষয়কে তার *Commodities and Capabilities* প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন (Sen ১৯৮৫)। তার মতে কাউকে কোন পণ্য দিলেই তার জীবনযাত্রার মান বদলে যায় না। বদলানোটা নির্ভর করে ওই পণ্যটি ব্যবহার করার সক্ষমতা ওই ব্যক্তিটির রয়েছে কিনা তার ওপর। আমাদের সমাজে যে অর্থনৈতিক সুযোগগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করার জন্য নারীর উপায় বা

ক্ষমতা থাকে না। যেমন, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে নারীরা অনেক কাজ করতে পারে না কিংবা শুধুমাত্র স্বল্প আয়ের এবং নিচু পর্যায়ের কাজগুলোতে অংশ নিতে পারে। এটি এমনকি বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সত্য, যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ শ্রমিকই নারী। প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, কর্পোরেট খাত ইত্যাদির বেলায়ও এটি বিদ্যমান। আর এ কারণেই দেখা দেয় আয় বৈষম্য। অর্থনীতিবিদ এবং তাত্ত্বিকগণ, যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল, অ্যাডাম স্মিথ এবং কার্ল মার্কস, যুক্তি দিয়েছিলেন মানুষের সহজাত ক্ষমতা নয়, বরং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায় (Schultz ১৯৭৫; Mill ১৮৪৮; Smith ১৭৭৬; Marx and Engels ১৯০৬)। সমাজের আয় বৈষম্য এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। গ্যারি বেকার, থিওডোর শুলজ এবং অ্যাডাম স্মিথের মতো অর্থনীতিবিদগণ তাই তাদের বিখ্যাত 'মানব মূলধন' (Human Capital) তত্ত্বের মাধ্যমে মানব মূলধনের ওপর বিনিয়োগ করতে বলেছেন (Becker ১৯৯৩; Schultz ১৯৭৫; Smith ১৭৭৬)। তার সুফল যদিও ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু তা সুদূর প্রসারী।

নারীর প্রতি বৈষম্যের আর একটি কারণ নিহিত রয়েছে খোদ অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোর মধ্যে, কেননা এ তত্ত্বগুলো পুরোপুরি লিঙ্গান্ধ (জেন্ডার ব্লাইন্ড)। প্রচলিত অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশের মধ্যে নারীর কাজকে অর্থপূর্ণ ও উৎপাদনশীল ধরা হয়নি। অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলোতে নারীর অ-আর্থিক কাজগুলোকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাইরে ধরা হয়। গতানুগতিক নয়া ক্ল্যাসিকাল ব্যষ্টিক অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যদি এমন কোন পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা ভোগের সাথে জড়িত থাকে যার বিনিময় মূল্য আছে, অর্থাৎ বাজারে যা অর্থের বিনিময়ে কেনা বেচা করা যাবে শুধুমাত্র সেসব পণ্যই হিসাবের মধ্যে থাকবে। নারী এবং পুরুষের কর্ম পরিধির ভিন্নতার কারণে অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। মূলত: পুরুষের প্রধান ভূমিকা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণের জন্য ঘরের বাইরে কাজ করা। আর এই কাজের বিনিময়ে সে অর্থ উপার্জন করে। অন্যদিকে বেশিরভাগ নারী ঘরের কাজকর্ম করে থাকে যার কোন আর্থিক বিনিময় মূল্য নেই। পুরুষ বাজারে যা উৎপাদন করছে, কিনছে বা ভোগ করছে তা হয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, আর নারী ঘরে পরিবারের জন্য যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও ভোগ করছে তা হচ্ছে অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এই ধরনের অর্থনৈতিক তত্ত্ব নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জিডিপি হিসাব করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই তত্ত্ব খণ্ডিত এবং ভ্রান্ত। যার ফলে জিডিপিতে নারীর অবদান খুব কম দেখানো হয়।

অ-আর্থিক গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডকে জিডিপি পরিমাপের মধ্যে না আনার ফলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন বিভ্রান্তিমূলক হয়। জাতিসংঘ ১৯৫৩ সালে যখন প্রথম সিস্টেম অব ন্যশনাল এ্যাকাউন্টস বা এসএনএ পদ্ধতিটি প্রকাশ করে তখন তাতে যে সমস্ত পণ্য ও সেবা ঘরের ভেতরে ভোগের জন্য উৎপাদিত হয় এবং যা বাজারজাত করা হয় না তাকে জিডিপির বাইরে রাখা হয়। (United Nations ১৯৫৩) নারীবাদীদের দাবীর প্রেক্ষিতে বহু বছর পর ১৯৯৩ সালে এসএনএ (United Nations ১৯৯৩) কিছুটা সংশোধন করে তাতে পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এতে করেও সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধান হয়নি। কেননা পারিবারিক সেবা উৎপাদন, যার বিনিময়ে কোনো অর্থ উপার্জিত হয় না, তা এসএনএ-এর উৎপাদন সীমানার বাইরেই রয়ে যায়। জাতিসংঘের এসএনএ তার মূল অ্যাকাউন্টের বা হিসাবের বাইরে আলাদা স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্টের অর্থাৎ এক ধরনের উপ বা সংযুক্তি হিসাবের মাধ্যমে পারিবারিক উৎপাদন ও ভোগের হিসাব দেখানোর সুপারিশ করে যাতে মূল হিসাবটি ঠিক থাকে। কিন্তু এতে নারীর অবদান মূলধারার বাইরেই রয়ে যায়। এটি কেবল একটি প্রাথমিক এবং অস্থায়ী পদ্ধতি। বিনা পারিশ্রমিকে সম্পাদিত নারীর গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডকে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করতে হলে যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে সেগুলো হলো গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত সময় হিসাব, সেই কাজের মূল্য নির্ধারণ, সেই মূল্য দিয়ে স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট তৈরি, নিয়মিতভাবে এই হিসাব চালিয়ে যাওয়া এবং সবশেষে জাতীয় হিসাবের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমানে ৮২টির বেশি দেশে গৃহস্থালী কাজে

ব্যয়িত সময়ের জরিপ পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে তার অর্থমূল্য নির্ধারণ এবং স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট তৈরির কাজটি এখনো সুদূর পরাহত। এ অবধি শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানি নিয়মিতভাবে গৃহস্থালী কাজের সময় ব্যয় জরিপ চালিয়ে যেতে ও স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট তৈরি করে একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পেরেছে।

আমাদের দেশে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। যদিও সর্বশেষ তথ্য পাওয়া দুষ্কর, তবে ২০০৫-০৬-এর শ্রমশক্তি জরিপে দেখা গিয়েছে যে মোট শ্রমশক্তির ২৯.২ শতাংশ নারী, ১৯৮৫-৮৬ সালে যা ছিল ৯.৪ শতাংশ। নারী শ্রমশক্তি বৃদ্ধির এই হার ধরলে ২০০৯-১০ সালে তাদের অংশ ৩৭.১ শতাংশ হওয়ার কথা। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আইএলও-র সংজ্ঞা অনুযায়ী এই শ্রমশক্তি শুধুমাত্র সেসব পণ্য ও সেবা উৎপাদন এবং ভোগ করে যার বাজার মূল্য রয়েছে। এখানেও সেই অর্থনৈতিক এবং অ-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে গৃহস্থালী কাজে যে এর চেয়ে বহুগুণ সময় ব্যয় হচ্ছে তা হিসাব করলে নারী শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার অনেক বেশি হবে সন্দেহ নেই। এতে অর্থনীতিতে তার অবদানও বেড়ে যাবে উল্লেখযোগ্যভাবে। যেমন ড. আবুল বারকাতের সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী গৃহস্থালী কর্মকাণ্ডে নারীর অবদানের অর্থনৈতিক মূল্য পরিমাপ করলে বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর অবদান দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশ (বারকাত ২০১০)। শামীম হামিদ ১৯৯৪ সালে হিসাব করেছিলেন ঘরের ভেতরে ও বাইরে নারীর কাজগুলোর অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করলে জিডিপিতে নারীর অবদান দ্বিগুণ হয়ে যাবে (Hamid ১৯৯৪)। এই বিশাল অমূল্যায়িত শ্রমশক্তির কারণেই নারীরা সমাজে অবস্থানগতভাবে অধস্তন। এ ব্যাপারে শুধু নীতি নির্ধারকদেরই নয়, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং নারী উন্নয়ন কর্মীদেরও আরও অধিক সচেতন হতে হবে, যাতে নারীর অমূল্যায়িত গৃহস্থালী কর্মকাণ্ড সামষ্টিক অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া যায়। এটি শুধুমাত্র জিডিপির হিসাব পদ্ধতিটিকে ত্রুটিমুক্ত করবে না, বরং নারীর অর্থনৈতিক অবদানের সঠিক মূল্যায়ন এবং নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটাতেও অনেকখানি সহায়তা করবে।

৩. নারী বাজেট: কী ও কেন

বাজেট প্রক্রিয়ায় নারীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোকেই সাদামাটাভাবে জেন্ডার বাজেট বলা যেতে পারে। আরেকটু বিশদভাবে বলতে গেলে জেন্ডার বাজেটিং হচ্ছে বাজেটের জেন্ডার ভিত্তিক মূল্যায়ন, বাজেটের সকল পর্যায়ে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্ভুক্তি, এবং রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পুনর্বিন্যাসে জেন্ডার সমতা রক্ষা করা। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের অর্থ এই নয় যে নারীর জন্য আলাদাভাবে বাজেট তৈরি করতে হবে। বরং বিদ্যমান জাতীয় বাজেটে জেন্ডার সমতা রক্ষার জন্য নীতিমালা ও বরাদ্দ করাই হচ্ছে জেন্ডার বাজেটিং-এর উদ্দেশ্য (চিত্র ১)। এক্ষেত্রে সরকারী অর্থায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত – খানা বা পরিবার নয়, বরং নারী এবং পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার ভিত্তিতেই রাজস্ব আহরণ এবং সরকারী ব্যয় নির্ধারণ করা। নারী সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করতে হলে নারীর অ-আর্থিক কাজের মূল্যায়ন করাটাও জরুরি। কেননা অর্থনীতিতে নারীর অবদানগুলো সঠিকভাবে জানা থাকলেই কেবল নারীর জন্য সঠিক বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব।

বিভিন্ন দেশে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, যেহেতু জেন্ডার সমতার ফলে মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সুতরাং এতে করে এসব দেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে যে সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনের কথা বলা হচ্ছে তার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর জন্য অর্থায়ন বৃদ্ধি করে নারীর উন্নয়ন করা।

চিত্র ১: জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের লক্ষ্য

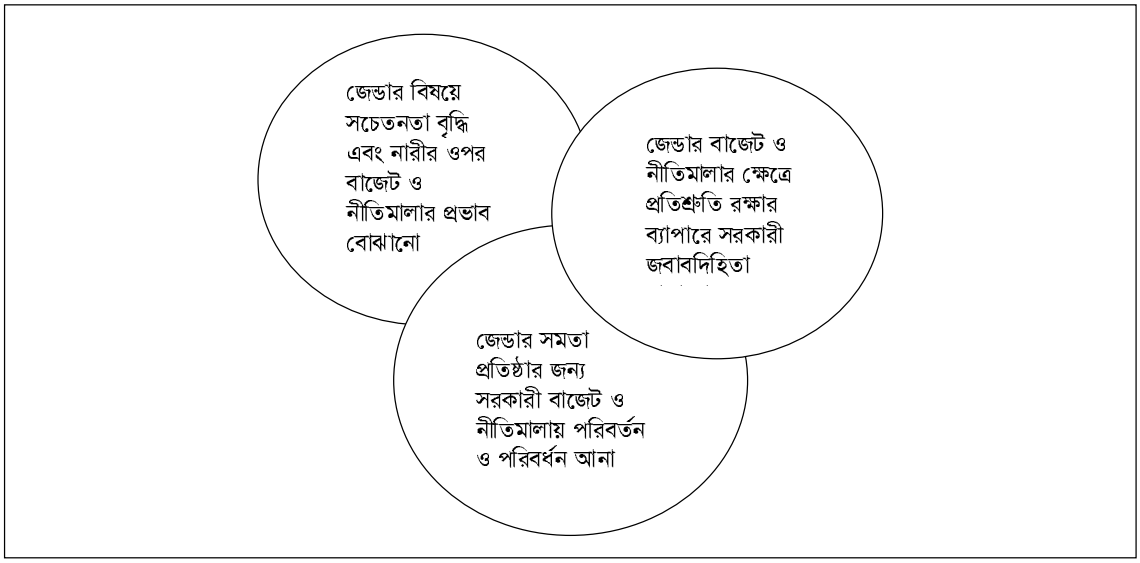

সূত্র: Sharp (২০০৩)।

৩.১ দেশে দেশে নারী বাজেট

বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণীত হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া সর্বপ্রথম ১৯৮৪ সালে নারী সংবেদনশীল বাজেট তৈরি করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯৯৫ সালে এ নিয়ে কাজ শুরু করে এবং সেদেশের সরকার ১৯৯৭ সালে নারী সংবেদনশীল বাজেট বিশ্লেষণ করে। এছাড়াও চিলি, ব্রাজিল, তানজানিয়া, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, যুক্তরাজ্য, ফিলিপাইন, কোরিয়া এবং ভারতসহ ৫০টির বেশি দেশে কোন না কোন ধরনের জেন্ডার বাজেট উদ্যোগ রয়েছে (UNIFEM ২০০১) (যদিও কোন কোন দেশে শুধু একবারই এ ধরনের কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে)।

৩.২ বাংলাদেশে নারী বাজেট

বাংলাদেশে নারী আন্দোলনকারীদের বহুদিনের দাবীর মুখে ২০০৬-০৭ অর্থবছরের বাজেটে "জেন্ডার বাজেটিং" শিরোনামে সাত লাইনের একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে সেটি ছিল দায়সারা গোছের। কেননা বিভিন্ন খাতে নারীর জন্য বরাদ্দে তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি বা এসব বরাদ্দের কোন পরিষ্কার হিসাবও ছিল না। যদিও নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এখন অনেকাংশে জাতীয় নীতিতে মূল্যায়িত হচ্ছে তারপরও এর অগ্রগতি সামান্য। একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে উপেক্ষা করে একটি টেকসই অর্থনৈতিক অবকাঠামো কখনোই চিন্তা করা যায় না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেও নারীর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও তাদের ক্ষমতায়ন দেশের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আর নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম ধাপ হচ্ছে তাদের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ। যেহেতু এদেশ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে সেজন্যই আলাদাভাবে নারীর জন্য বর্ধিত বরাদ্দ প্রয়োজন, যাতে নারীরা সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একীভূত হওয়ার জন্য সুযোগ পায়। বাংলাদেশের শ্রম খাতে নারীদের অবস্থান কোন পর্যায়ে রয়েছে, তার কিছু তথ্য সারণি ১ ও ২-এ তুলে ধরা হলো, যা নারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

সারণি ১: বাংলাদেশের শ্রম বাজারে লিঙ্গ বৈষম্য

নির্দেশক	নারী	পুরুষ
শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ (শতকরা হার)	২৯.২	৮৬.৮
মজুরিবিহীন পারিবারিক শ্রম (শতকরা হার)	৬০.১	৯.৭
স্বনিয়োজিত (শতকরা হার)	১৫.৯	৫০.০
কর্মীর শতকরা হার (মাসিক মজুরি অনুর্ধ্ব ৩০০০ টাকা)	৬২.৪	৬১.৬
কর্মীর শতকরা হার (সাপ্তাহিক মজুরি অনুর্ধ্ব ৫০০ টাকা)	৮১.৭	৪৯.৭
উননিয়োজন হার	৭.০	৩.৪
শহর	৬.৭	৩.৬
গ্রাম	৭.২	৩.৩

সূত্র: BBS (২০০৭)।

সারণি ২: ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী কর্মজীবিদের খাতওয়ারী অংশগ্রহণ

খাত/উপখাত	সর্বমোট শ্রমশক্তি ('০০০)	পুরুষ (%)	নারী (%)
মোট	৪৪৩২২	৭৭.৮	২২.২
কৃষি	২১২৪৬	৭৪.৯	২৫.১
বনজ	৬৪১	৩৫.৭	৬৪.৩
মৎস্য সম্পদ	১০৪৪	৯৮.৪	১.৬
খনিজ ও খনন	৮২	৯৭.৬	২.৪
শিল্প (উৎপাদন)	৪৩৪৩	৬০.৭	৩৯.৩
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ	৯৮	৯১.৮	৮.২
নির্মাণ	১৫৪১	৯৩.৮	৬.২
পাইকারী ও খুচরা বাণিজ্য	৬১০৮	৯৬.৫	৩.৫
হোটেল ও রেঁস্তোরা	৫৬৩	৯৪.১	৫.৯
পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৩০১৫	৯৯.১	০.৯
আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	২২৩	৯১.৫	৮.৫
রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য	১৯৪	৯৫.৯	৪.১
লোক প্রশাসন	৯৮৮	৯১.৪	৮.৬
শিক্ষা	১১৮৫	৭৩.২	২৬.৮
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৫০৪	৭০.৮	২৯.২
কমিউনিটি ও ব্যক্তিগত সেবা	১৭৬৯	৫৯.১	৪০.৯
অন্যান্য	৭৮০	১১.৫	৮৮.৫

সূত্র: BBS (২০০৭)।

জাতিসংঘের জেন্ডার উন্নয়ন সূচক এবং জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক দুটির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে নারী-পুরুষের অবস্থান দেখানো হয় এবং সূচক অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের অবস্থানও দেখানো হয়। জেন্ডার উন্নয়ন সূচকে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা প্রতিফলিত হয়। জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে জেন্ডার উন্নয়ন সূচক ০.৫৩৬ (UNDP ২০০৯)। আর ১৫৫টি দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান হচ্ছে ১২৩তম (সারণি ৩)। এই সূচকের অর্থ হচ্ছে নারীরা পুরুষের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে, জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচকের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয় নারীরা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে কতটুকু অংশগ্রহণ করতে পারছে। জাতীয় সংসদে পুরুষের তুলনায় শতকরা কত জন নারীর আসন রয়েছে, কত জন নারী মন্ত্রী রয়েছেন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক পর্যায়ে কত ভাগ নারী, বিভিন্ন পেশাগত ও কারিগরী কাজে নারীর অংশগ্রহণের হার কত এবং তাদের আয় বৈষম্য ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মতো তথ্যগুলোর মাধ্যমে জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক তৈরি করা হয়। অর্থাৎ এখানে কিছু নির্ধারিত ক্ষেত্রে

সুযোগের বৈষম্য তুলে ধরা হয়। বর্তমানে ১০৯টি দেশের মধ্যে জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৮ (সারণি ৩)। বাংলাদেশের জন্য এই সূচকটি হচ্ছে ০.২৬৪, অর্থাৎ নারী-পুরুষ বৈষম্য এক্ষেত্রে আরও ব্যাপক। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পরে সর্বশেষ ১০৯তম দেশটি হচ্ছে ইয়েমেন।

সারণি ৩: বিভিন্ন দেশের HDI, GDI এবং GEM সূচকের তুলনামূলক অবস্থান

দেশ	HDI সূচক		GDI সূচক		GEM সূচক	
	ক্রম	মান	ক্রম	মান	ক্রম	মান
নরওয়ে	১	০.৯৭	২	০.৯৬	২	০.৯১
অস্ট্রেলিয়া	২	০.৯৭	১	০.৯৭	৭	০.৮৭
বাংলাদেশ	১৪৬	০.৫৪	১২৩	০.৫৪	১০৮	০.২৬
ভারত	১৩৪	০.৬১	১১৪	০.৫৯	..	..
পাকিস্তান	১৪১	০.৫৭	১২৪	০.৫৩	৯৯	০.৩৯
শ্রীলংকা	১০২	০.৭৬	৮৩	০.৭৬	৯৮	০.৩৯
নেপাল	১৪৪	০.৫৫	১১৯	০.৫৫	৮৩	০.৪৯

সূত্র: UNDP (২০০৯)।
দ্রষ্টব্য: HDI: Human Development Index; GDI: Gender Development Index; GEM: Gender Empowerment Measure.

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য না থাকলেও (সারণি ৪) উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে শিক্ষার্থী ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ০.৫৩। বয়স্ক শিক্ষার হার পুরুষের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬.৩ ভাগ, নারীর ক্ষেত্রে শতকরা ৪৪.২ ভাগ। আয়ের ক্ষেত্রে, শিল্পোৎপাদন খাতে একজন নারীর আয় একজন পুরুষের আয়ের মাত্র ৫৩ শতাংশ। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা কাজে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৬ শতাংশ, আর পেশাগত ও কারিগরী কাজে তা মাত্র ২৫ শতাংশের কাছাকাছি। মোট নিয়োজিত শ্রমশক্তিতে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় শতকরা ৩১ ভাগ। অন্যদিকে শতকরা ৪০ ভাগ নারী স্বামী দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

সারণি ৪: বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে নারী-পুরুষের অবস্থানের তুলনামূলক চিত্র

(শতকরা হার)

		বয়স			
বছর		৫-৯ বছর	১০-১৪ বছর	১৫-১৯ বছর	২০-২৪ বছর
২০০১	সর্বমোট	৪৮.৬	৬২.৯	৩৭.৯	১২.৮
	পুরুষ	৪৮.৪	৬১.৩	৪০.৪	১৯.৪
	নারী	৪৮.৮	৬৪.৭	৩৫.২	৭.৭
১৯৯১	সর্বমোট	৪১.০	৫৪.২	২৮.৪	৯.৯
	পুরুষ	৪২.৩	৫৬.০	৩৫.৮	১৬.৬
	নারী	৪০.০	৫২.৩	২০.৭	৪.১
১৯৮১	সর্বমোট	২২.৫	৩৩.৩	১৭.০	৭.০
	পুরুষ	২৪.৭	৩৭.৯	২৫.৪	১২.২
	নারী	২০.২	২৮.১	৮.৩	২.৩

সূত্র: BBS (২০০৮)।

৪. ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নারীর জন্য পদক্ষেপ

বর্তমান সরকারের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে যে মাইলফলকগুলো অর্জন করার অঙ্গীকার করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ২০১৭ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে, শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫তে এবং মানব জীবনের গড় আয়ুষ্কাল ৭০ বছরে উন্নীত করা। বাংলাদেশ সংবিধানের ১০ এবং ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেট অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কিছু পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, চারটি মন্ত্রণালয়ে, যথা – শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে নারীর জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা, যার পরিমাণ ৯,৬৬০.০৮ কোটি টাকা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোট বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল তার মধ্যে ২৯.৭৪ শতাংশ রাখা হয়েছিল নারী উন্নয়নে। তবে ২০০৯-১০ সালের সংশোধিত বাজেটে তা প্রকৃতপক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মোট বাজেটের ২৪.৬৫ শতাংশে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাবরই মোট বাজেটের ১ শতাংশের মতো বরাদ্দ থাকে (সারণি ৫)।

সারণি ৫: জাতীয় নীতিমালায় নারী বিষয়ক খাতে বরাদ্দ

(শতকরা হার)

অর্থবছর	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেটে বরাদ্দ	নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ	পরিকল্পনা	নারীর জন্য বরাদ্দ
২০০২-০৩	০.৩৩	-	দ্বিবার্ষিক	০.২৭
২০০৩-০৪	০.৪২	-	(১৯৭৮-৮০)	
২০০৪-০৫	০.৯৮	-	২য় পঞ্চবার্ষিক	০.১৮
২০০৫-০৬	০.৯৮	-	(১৯৮০-৮৫)	
২০০৬-০৭	১.০০	২০.৩৩	৩য় পঞ্চবার্ষিক	০.১৩
২০০৭-০৮	১.১৯	২৫.৬১ (সংশোধিত)	(১৯৮৫-৯০)	
২০০৮-০৯	১.২৯	২৯.৬৫ (সংশোধিত)	৪র্থ পঞ্চবার্ষিক (১৯৯০-৯৫)	০.১৪
২০০৯-১০	১.১০	২৪.৬৫ (সংশোধিত)	৫ম পঞ্চবার্ষিক	
২০১০-১১	০.৯৪	২৫.৯৬	(১৯৯৭-২০০)	০.১৪

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৪.১ আর্থিক পদক্ষেপ

২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে প্রথমবারের মতো নারী করদাতাদের করমুক্ত ব্যক্তিগত আয়ের স্তর সাধারণ করদাতাদের চেয়ে বাড়ানো হয়। সাধারণের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ১,৫০,০০০ টাকা এবং নারীর জন্য ১,৬৫,০০০ টাকা করা হয়। তেমনি কৃষি থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষেত্রে নারীর জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ২,১৫,০০০ টাকা করা হয়, যেটি পুরুষের জন্য ২,০০,০০০ টাকা করা হয়। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তবে গত তিনটি অর্থবছরে করমুক্ত আয়ের সীমায় কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির কথা বিবেচনা করে করমুক্ত আয়ের সীমা আরও একটু বাড়ানো প্রয়োজন।

নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন দাবীর কথা শোনা যায়। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা এবং এই খাতে বরাদ্দের

ন্যূনতম শতকরা ১৫ ভাগ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রাখার প্রস্তাব করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে নতুন কোন প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানো ছাড়াও ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীদের জন্য শুল্ক সংক্রান্ত কিছু সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। যেমন নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মূল্য সংযোজন করের হার কম রাখা, তাদের ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্ক রেয়াত বা কমানো এবং অন্যান্য শুল্ক হার কম রাখা, শুল্ক অবকাশের সময়সীমা বাড়ানো ইত্যাদি সুবিধা নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তার জন্য বর্তমান বার্ষিক ৪০ লাখ টাকা টার্নওভার সীমা পর্যন্ত ৪ শতাংশ টার্নওভার কর প্রদানের বিদ্যমান সুবিধাকে আরও বাড়িয়ে টার্নওভারের সর্বোচ্চ সীমা ৬০ লাখ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার হলে ৪ শতাংশ হারে কর প্রদানের সুবিধা পাওয়া যাবে। এতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধা হবে।

৪.২ খাতওয়ারী বরাদ্দ

২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মানব সম্পদ এবং কৃষিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই দুটো ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ এবং কল্যাণ নানাভাবে জড়িত। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে দ্বিতীয়বারের মতো জেন্ডার বাজেটিং-এর অংশ হিসেবে দশটি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের হিসাব দিয়ে আলাদা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দশটি মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদাভাবে বাজেট বরাদ্দ উপস্থাপন করার উদ্যোগটি প্রশংসনীয়। তবে যদি বরাদ্দের পরিমাণ দেখা হয়, তাহলে প্রতীয়মান হয় যে সেখানে এখনও নারী-পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়ে গিয়েছে। যেমন, দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠীই যেখানে নারী, সেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ব্যয়ের যথাক্রমে শতকরা ২৩.২৯ ভাগ ও ৩২.৮৩ ভাগ মাত্র নারীর জন্য ব্যবহৃত হবে বলা হয়েছে। একইভাবে, কৃষি মন্ত্রণালয়ে নারীর জন্য রাখা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৬.৫৩ শতাংশ। অথচ কৃষিতে উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি পর্যায়ে, বাজারজাতকরণের আগ পর্যন্ত সব ধরনের কর্মকাণ্ডে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে কৃষি খাতে নারী শ্রম নিয়োজনের হার শতকরা ২৫.১ ভাগ দেখানো হয়েছে, তবে এটি শুধুমাত্র আর্থিক মূল্যের হিসাবে করা হয়েছে। বিনা পারিশ্রমিকে কৃষি খাতে নারীর অংশগ্রহণ হিসাব করলে তা আরও অনেক বেশি হবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু কল্যাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরের বাজেটে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন মিলিয়ে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের জন্য ১,২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, জেন্ডার সমতা আনয়নের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট ব্যয়ের ২৫.৯৬ শতাংশ এবং জিডিপির ৪.৪ শতাংশ।

এ বছর যে মন্ত্রণালয়গুলোর জন্য নারী বাজেট করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কৃষি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, পরিবেশ ও বন, মৎস্য ও পশুপালন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, সমাজ কল্যাণ, এবং পানি সম্পদ। এর মধ্যে শতাংশ হিসেবে নারীর জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ রয়েছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। এখানে মোট বরাদ্দের ৭৭.৮৩ শতাংশ (৩,২৮৬.১৬ কোটি টাকা) নারীর জন্য রাখা হয়েছে। শতাংশ হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে পল্লী ও সমবায় (৬২.২৮ শতাংশ) এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে পরিবেশ ও বন (৪৪.২২ শতাংশ) (সারণি ৬)। তবে টাকার অংকে প্রকৃত বরাদ্দ হিসেবে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (২,৬৩৪.৫৫ কোটি টাকা), তৃতীয়তে শিক্ষা (২,৩০২.২৯ কোটি টাকা), এবং চতুর্থে কৃষি (১,৭৮৮.৬৮ কোটি টাকা)। এই হিসাবগুলো কীভাবে করা হয়ে থাকে সে ব্যাপারে কোন বাজেটেই ব্যাখ্যা থাকে না। তাছাড়া খাতওয়ারী বরাদ্দের মধ্যে কিছু কিছু খাতে নারী কীভাবে বরাদ্দের ভাগ পাচ্ছে তা বিভ্রান্তিমূলক। যেমন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দে দেখানো হয়েছে কৃষি খাতে ভর্তুকির ৩০ শতাংশ যাবে নারীর জন্য। তবে প্রশ্ন হলো এটি শুধুমাত্র কৃষিখাতে নারীর অংশগ্রহণের হার দিয়ে আনুপাতিক হারে হিসাব করে বের করা হয়েছে কিনা। তাই যদি হয় তাহলে এটি সঠিক নয়।

কেননা, কৃষি উৎপাদনের যে পর্যায়ে ভর্তুকিকৃত সার, ডিজেল এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হয় সেখানে খুব কম নারীই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।

সারণি ৬: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	নারী উন্নয়নে মোট বরাদ্দের %	মোট এডিপি (কোটি টাকা)	এডিপিতে নারীর অংশ (%)
কৃষি	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	৬৭৪২.১২	২৬.৫৩	১০৫৪.১২	২৯.৩৫
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা*	২০০৯-১০	৫৮৭৫.০০	৬৫.৮৩*	১৩৪৫.৩৪	৪২.৩০
	২০১০-১১	৪১৯৭.৮২	৭৭.৮৩	২১৯.০৮	৪৫.৮৩
শিক্ষা*	২০০৯-১০	৭৪১৫.৬৯	১৮.২৯*	১১০১.১০	৪৩.৪০
	২০১০-১১	৯৮৮৫.৩২	২৩.২৯	১৬৮৫.৬৫	৫০.৭৬
পরিবেশ ও বন	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	১১৯৮.৪৬	৪৪.২২	২৪২.৫২	৫৮.৩৯
মৎস্য ও পশুপালন	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	৮৬১.৪৮	৩২.৬১	৩৭৩.৪৬	৫৭.৪৭
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ*	২০০৯-১০	৭০০০.৩৬	৩২.৮৩*	৩০৭৫.৩৩	৪৮.৯০
	২০১০-১১	৮১৪৮.৯২	৩২.৩৩	৩৪৭২.৯২	৫৪.১১
ভূমি	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	৫৫৬.৬২	১৮.৪০	৯৯.০৫	২৯.০২
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	৬৮৫.১৭	৬২.২৮	৪৬৮.৫৬	৮৪.৫৬
সমাজ কল্যাণ*	২০০৯-১০	১৩০২.৮১	১৭.৪০*	১০৯.৩১	৪৮.৭০
	২০১০-১১	১৯২২.৩৪	১৯.৯১	২৩৪.৬৬	৫০.০৫
পানি সম্পদ	২০০৯-১০	-	-	-	-
	২০১০-১১	২০৪৮.৯৯	৩৯.১৬	১৪০৬.৭৩	৫৩.৩৯

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।
দ্রষ্টব্য: *খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যবহৃত অর্থের শতকরা অংশ।

টাকার অংক ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কতখানি সমতা অর্জিত হয়েছে তারও একটি চিত্র পাওয়া যায় জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্টে। এতে দেখা যায় ২০০৯-১০ অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ এবং সংস্থায় মোট নিয়োজনের মধ্যে কর্মকর্তা বা অফিসার পদে নারীর অংশগ্রহণ বেশ কম। সবচেয়ে বেশি কর্মকর্তা পদে অংশগ্রহণের হার ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৫.৩ শতাংশ; তারপর সমাজ কল্যাণ (২৩.২ শতাংশ); এবং এরপরে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে (২১.১ শতাংশ)। এই তিনটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আবার নারী কর্মচারী নিয়োজনের হার সর্বোচ্চ ছিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে (৪৫.৫ শতাংশ); তারপর পর্যায়ক্রমে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে (৩৪.৪ শতাংশ) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে (২৫.৭ শতাংশ) (সারণি ৭)। নিয়োজনের হার থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে নীতি নির্ধারণী কিংবা উচ্চতর পদে নারীর অংশগ্রহণ এখনও অনেক কম। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীরা যুক্ত হতে না পারলে নারী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং নীতিমালায় পরিবর্তন আনা কষ্টকর।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে আরও কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের কার্যক্রম বর্তমানের ৪৫টি উপজেলার সাথে আরও ১৭টি উপজেলায় বিস্তৃত করা; এসিডদগ্ধ নারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুর্নবাসন এবং নারীর আত্মকর্মসংস্থান তহবিলে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা।

সারণি ৭: দশটি মন্ত্রণালয়ে নারী ও পুরুষের নিয়োজনের হার: ২০০৯-১০

(শতকরা হার)

মন্ত্রণালয়	কর্মকর্তা		কর্মচারী	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
কৃষি	৯৫.৩	৪.৭	৯১.১	৮.৯
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৯৬.১	৩.৯	৯৩.৫	৬.৫
শিক্ষা	৭৪.৭	২৫.৩	৭৪.৩	২৫.৭
পরিবেশ ও বন	৯৪.০	৬.০	৯৮.২	১.৮
মৎস্য ও পশুপালন	৯৪.১	৫.৯	৯৭.০	৩.০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৭৮.৯	২১.১	৫৯.৫	৪০.৫
ভূমি	৯৪.৭	৫.৩	৯৪.৯	৫.১
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৯৩.৪	৬.৬	৮৬.১	১৩.৯
সমাজ কল্যাণ	৭৬.৮	২৩.২	৬৫.৬	৩৪.৪
পানি সম্পদ	৮৬.০	১৪.০	৮৩.৩	১৬.৭

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৪.৩ কর্মসংস্থান

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান শীর্ষক একটি কর্মসূচির আওতায় ১,১৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটে ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব রয়েছে এবং ৬৪টি জেলায় ১৭ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। হতদরিদ্রদের জন্য এটি একটি ভালো উদ্যোগ। এই কর্মসূচিতে কত শতাংশ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯,৪৯৭ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, যা উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের ১৪.৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫ শতাংশ। এখানে কত ভাগ হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত নারীরা পাচ্ছে তার হিসাব থাকা প্রয়োজন। তেমনি ২০০৯-১০ অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে সর্বমোট প্রায় ৫.২৭ কোটি জন-মাসের কাজ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রায় ৬,২৭ কোটি জন-মাসের কাজ সৃষ্টি হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এই কর্মসংস্থানের সুযোগ যাতে নারীরাও পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের তৃতীয় আরেকটি অনুষঙ্গ হলো অর্থনৈতিক সুযোগের এবং আয়ের নিরাপত্তা। যেকোন ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা কিংবা মহামারী, সামাজিক ব্যাধি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দরিদ্র জনগণই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা কম। তাদের মধ্যে দরিদ্র নারীদের অবস্থা আরও বেশি সঙ্গীন। এ ধরনের বিপর্যয়ের সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের সহায়তা না করলে তারা হতদরিদ্রই রয়ে যাবে। সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ২০১০-১১ অর্থবছরের মোট বাজেটের ১৪.৮ শতাংশ, যা দিয়ে নারীসহ চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কার্যক্রমের আওতায় সাহায্য করা হবে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যে কার্যক্রমগুলো নেওয়া হয়ে আসছে সেগুলো প্রশংসার দাবী রাখে। তবে সেখানে নারীদের সংখ্যা আরও বাড়ানোর অবকাশ রয়েছে। এই কর্মসূচিগুলোর গুণগত ও পরিমাণগত মান বাড়িয়ে অধিক সংখ্যক নারীদের এই বেষ্টনীর মধ্যে আনা এবং প্রকৃত সহায়তা তাদের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের জন্য দুঃস্থ ভাতা বাবদ বরাদ্দ ৩৩১.১ কোটি টাকায় উন্নীত করার কথা বলা হয়েছিল। ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটেও একই পরিমাণ অর্থের কথা

বলা হয়েছে, অর্থাৎ এখানে কোন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়নি। ভাতার পরিমাণও বাড়ানো হয়নি। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৩৪,৫৩২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫,৫৩৪ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ হয়েছে। এই খাস জমির বন্দোবস্ত যাতে নারীরাও পায় সে ব্যাপারে সরকারের বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। কেননা দরিদ্র জনগণের মধ্যে নারী দরিদ্রের সংখ্যা বেশি। ২০০৫ সালের খানা আয়-ব্যয় সমীক্ষা (Household Income and Experditure Survey (HIES)) অনুযায়ী চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার জাতীয়ভাবে শতকরা ২৫ ভাগ হলেও শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রে তা শতকরা ২৯.৬ ভাগ (BBS ২০০৫)। বর্তমান সরকারের শাসনামলে ভূমি মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২২,২৬১টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১০,২২৭ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছে। এখানে কত জন নারী বন্দোবস্ত পেয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য জানানো প্রয়োজন।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন ও মানব দারিদ্র দূরীকরণের জন্য 'ঘরে ফেরা কর্মসূচি'-র উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে ২২১টি বস্তিবাসী পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং ১২০টি পরিবারের মধ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এবারের বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে এই কার্যক্রমের কলেবর আরও বৃদ্ধি করা হবে। এতে নারী প্রধান পরিবারগুলো যাতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেই উদ্যোগ নিতে হবে।

৪.৫ অন্যান্য প্রস্তাব

বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে নারীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে যাতে প্রযুক্তি-নির্ভর চাকরিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কর্মজীবি মায়েদের শিশুদের যথাযথ যত্ন নিশ্চিত করার জন্য বর্তমানে বিদ্যমান দিবা-যত্ন কেন্দ্র ১৮টি থেকে বৃদ্ধি করে আরও ১০টি নতুন দিবা-যত্ন কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এটি তারপরও অনেক কম এবং ঢাকার বাইরের কর্মজীবি নারীদের জন্য কোন উদ্যোগ নেই। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে বর্তমানে ৬টি বিভাগীয় শহরের হাসপাতালে *ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার* স্থাপন করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এই কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আর কোথায় কোথায় এ ধরনের কার্যক্রম নেওয়া হবে এবং এর জন্য বরাদ্দ কত, তার কোন উল্লেখ বাজেটে নেই। তেমনি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কত জন নারী প্রশিক্ষণ পাবে, তার জন্য বরাদ্দ কত, এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যপারে কোন কিছু বলা হয়নি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার প্রত্যেক উপজেলায় থাকা প্রয়োজন। এছাড়া নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করে নারীদের আয়বর্ধক কাজে জড়িত করার ব্যাপারে বলা হলেও এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুল্লিখিত রয়েছে।

৫. শেষের আগে

জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে নারী উন্নয়ন না হওয়ার পেছনে শুধু কম বরাদ্দ নয়, আমাদের জাতীয় বাজেটের কিছু কিছু দুর্বলতাও এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। বাংলাদেশের জাতীয় রাজস্ব বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শতকরা ১৫.৪ ভাগ ব্যয় হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ (বাজেট বক্তৃতা ২০১০-১১)। কিন্তু সেখানে নারীদের অংশ খুব কম। কারণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হচ্ছে নারী। তার মধ্যে আবার কর্মকর্তা পর্যায়ে নারীর সংখ্যা অনেক কম, বেশির ভাগই কর্মচারী পর্যায়ে। যার ফলে বেতন ভাতা বাবদ রাজস্ব ব্যয়ে নারীদের অংশ খুব কম। বাজেটের আরেকটি অংশ হচ্ছে উন্নয়ন বাজেট। এই উন্নয়ন খরচ বাংলাদেশে বরাবরই রাজস্ব ব্যয়ের চাইতে কম হয়ে থাকে। দেখা গেছে বাংলাদেশে বার্ষিক

উন্নয়ন কর্মসূচী বা এডিপি বাস্তবায়নের হার খুব সন্তোষজনক নয়। স্বল্প ব্যয়ে নারী বা পুরুষ কারও জন্যই যথেষ্ট পরিমাণে উন্নয়ন ব্যয় সম্ভব নয়।

অর্থনীতিবিদ পল স্যামুয়েলসন ১৯৭৫ সালে বলেছিলেন "নারী আসলে পুরুষই, পার্থক্য হল তার কম অর্থ আছে।" বিচ্ছিন্নভাবে এই বক্তব্যটি অনেক নারীর উচ্চ পর্যায়ের কাজের এবং উচ্চ আয়ের মাধ্যমে খণ্ডন করলেও সাধারণভাবে নারীরা এখনও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে নারী ও পুরুষের আয়ের অনুপাত প্রায় ০.৫১, অর্থাৎ একজন নারী একজন পুরুষের আয়ের অর্ধেক উপার্জন করতে পারছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর পদচারণা বেড়ে চলা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো এখনও নারীর কাজের জন্য পুরোপুরি উপযোগী হয়ে ওঠেনি। তবে বৈষম্যের মাত্রা কমানোর জন্য শুধুমাত্র আয় বাড়ানোই একমাত্র নিয়ামক নয়। নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য ঘুচিয়ে সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতিমালা এবং যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে মানব উন্নয়নে ব্যয় বাড়ানো যেমন অপরিহার্য, তেমনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সক্ষমতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাও অত্যাবশ্যক।

গত দুই দশক ধরে নারীর জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রভাব ক্রমান্বয়ে বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীর মধ্যকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বা কমাতে, এবং আয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার ফারাক বৃদ্ধিতে বা সংকোচনে সহায়তা করে। তাই সামষ্টিক অর্থনীতির নীতিমালায় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন থাকলে তা নীতিমালায় সমতা এবং দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করে, যার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রণয়নের পথ প্রশস্ত হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশে বরাবরই উন্নয়ন দলিলগুলোতে নারীকে উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে দেখা হয়েছে, মূল উন্নয়নকারী হিসেবে নয়। জাতীয় বাজেটেও যে প্রকল্পগুলো নারীদের জন্য রাখা হয় সেখানে তাকে দুঃস্থ ও বিত্তহীন নারী হিসেবে দেখা হয়ে আসছে। তাই নারীর ক্ষমতায়ন নয়, কেবল করুণাময় প্রকল্পসমূহ, যেমন বিভিন্ন ধরনের ভাতা দেওয়ার মধ্যেই সরকারি প্রয়াস সীমিত ছিল। সেটি থেকে একটু একটু করে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, মন্ত্রণালয়ের আলাদা বাজেট বাস্তবায়নের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়কে এবং অন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে যথাযথ জেন্ডার ফোকাল পয়েন্টকে শক্তিশালী করতে হবে, এবং মন্ত্রণালয়গুলোতে জেন্ডার মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো জেন্ডার বাজেটিং রিপোর্টে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ কোন কোন প্রকল্পে কীভাবে নারী উন্নয়নে ব্যয় হয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র থাকা প্রয়োজন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নারীদের জন্য যা বরাদ্দ করা হয় তা সঠিকভাবে বণ্টিত হচ্ছে কিনা, যাদের প্রয়োজন তারা পাচ্ছে কিনা, এবং তার মাধ্যমে কীভাবে তারা উপকৃত হচ্ছে তার সঠিক তত্ত্বাবধান করা অত্যন্ত জরুরি।

জেন্ডার বাজেট করলেই জাতীয় অর্থনীতির মূল ধারায় নারীর সম্পৃক্তি ঘটবে তা নয়। নারী সংবেদনশীল বাজেট বিশ্লেষণের ফলে বোঝা যায় নারীর জন্য কত কম বরাদ্দ রাখা হয়। নারী সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা মডেল নেই। বরং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ক নীতিমালায় নারীর সমতার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। তবে তা কেবলমাত্র কিছু সংস্কার প্রক্রিয়ার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। নারী সংবেদনশীল বাজেটকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হতে হবে। পাশাপাশি একটি ব্যাপক, পদ্ধতিগত এবং অংশগ্রহণমূলক সংখ্যাগত ও গুণগত তদারকি ব্যবস্থা এবং জেন্ডার বিভাজিত তথ্যভাণ্ডার জেন্ডার বাজেটিং সফল করার পূর্বশর্ত। সেই সাথে জাতীয় বাজেটে নারী সমতার কিছু পরিমাপযোগ্য মানদণ্ড তৈরি করে এর মূল্যায়ন করা যেতে পারে। তবে অ-আর্থিক কাজের মাধ্যমে নারী অর্থনীতিও সমাজে যে অবদান রাখছে তার মূল্যায়ন না হলে নারী উন্নয়ন হবে না।

References

আবুল বারকাত। ২০১০। *বাংলাদেশে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: মানব উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা ভাবতে হবে*। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ৮-১০ এপ্রিল, ঢাকা।

বাজেট বক্তৃতা ২০১০-১১ অর্থবছর। http://www.mof.gov.bd/ en/budg et/10_11/budget_speech /10_11_bn.pdf?phpMyAdmin=GqNisTr562C5oxdV%2CEruqlWwoM5

BBS. 2005. *Household Income and Expenditure Survey (HIES)*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

BBS. 2007. *Bangladesh Labour Force Survey 2005-06*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

BBS. 2008. *Statistical Yearbook of Bangladesh 2007*. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

Becker, G.S. 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Hamid, S. 1994. "Non-Market Work and National Income: The Case of Bangladesh." *Bangladesh Development Studies*, XXII (1 & 2).

Marx, K. and Engels, F. 1906. *Capital: A Critique of Political Economy*. Untermann, E. and Engels, F. (eds.) and Moore, S. and Aveling, E.B. (trans.). Chicago: Charles H. Kerr and Co.

Mill, J.S. 1848. *Principles of Political Economy*. London: Longmans, Green and Co.

Schultz, T. 1975. "The Value of the Ability to Deal with Disequilibira." *Journal of Economic Literature*, 13 (3): 827-846.

Sen, A.K. 1985. *Commodities and Capabilities*. Oxford: Oxford University Press.

Sharp, R. 2003. *Budgeting for Equity: Gender Budgeting Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting*. New York: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). http://ibdigital.uib.es/gsdl/collect/cd2/index/assoc/HASH0149/5bc2461f.dir/doc.pdf

Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1977 ed.). Chicago: University of Chicago Press.

UNDP. 2009. *Human Development Report 2009*. New York: United Nations Development Programme (UNDP).

UNIFEM. 2001. *Gender Budget Initiatives, Strategies, Concepts and Experiences*. Paper presented at a High Level International Conference on "Strengthening Economic and Financial Governance Through Gender Responsive Budgeting," 16-18 October, Brussels.

United Nations. 1953. A *System of National Accounts and Supporting Table, 1953*. New York: United Nations.

United Nations. 1993. *The System of National Accounts 1993*. New York: United Nations.

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ১১ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪১৭০৩, ৯১৪১৭৩৪,
ফ্যাক্স (৮৮০২) ৮১৩০৯৫১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd